

ঢাকার ভ্রমণযোগ্য স্থান গুলো

ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট করে তেমন কিছু জানা যায় না। এ সম্পর্কে অনেকগুলি প্রচলিত মত রয়েছে। যেমন-

শোনা যায়, বল্লাল সেন কতৃক নির্মিত ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি হয়েছে। অনেকে আবার বলেন ১৬১০ সালে ইসলাম খাঁ বুড়িগঙ্গার কাছে ঢাক বাজিয়ে যতদূর পর্যন্ত সেই ঢাকের শব্দ শোনা যায় ততদূর পর্যন্ত সীমানা নির্ধারণ করে ঐ এলাকাকে রাজধানী বানান। আর তাই সেই এলাকাকেই 'ঢাকা' নামে ডাকা হয়। অন্য আরেকটি জনশ্রুতি হচ্ছে- একসময় এ অঞ্চলে প্রচুর ঢাক নামক গাছ ছিল বলে এর নাম হয়েছে ঢাকা। এটাও শোনা যায় "ঢাকাইয় ভাষা" নামে একটি ভাষা এখানে প্রচলিত ছিল, সেই অনুসারে নাম হয়ে যায় ঢাকা। সাধারণ ভাবে এটাও শোনা যায়- এক সময় সারা অঞ্চলই ঘন বনে ঢাকা ছিলো বলে এর নাম হয়ে যায় ঢাকা।

ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ চিশতি বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে এর নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। প্রশাসনিকভাবে জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ হলেও সাধারণ মানুষের মুখে ঢাকা নামটিই থেকে যায়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২সালের ভাষা আন্দোলন দিয়ে শুরু হয়ে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফসল হিসেবে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ঢাকাতে রয়েছে অনেক দর্শনীয় স্থান। আর আজকের আমাদের এই লেখা সেই সমস্ত দর্শনীয় স্থান গুলি নিয়েই। কয়েকটি অংশে ভাগ করে আমি উপস্থাপন করছি এদের। আশা করি ভ্রমণ প্রেমিকদের খারাপ লাগবে না।

ঢাকা শহরের উদ্যান ও পার্ক সমূহ

বলধা গার্ডেন

ওয়ারীতে অবস্থিত এটি একটি উদ্ভিদ উদ্যান। বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী ৩.৩৮ একর জমির ওপর ১৯০৯ সালে উদ্যানটি নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। যা শেষ হতে সময় লেগেছিল প্রায় ৮ বছর। বিরল প্রজাতির ৮০০ গাছসহ বাগানটিতে প্রায় ১৮ হাজার গাছ রয়েছে। বর্তমানে এখানে ৬৭২ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। বাগানটিতে এমনও অনেক প্রজাতির গাছ রয়েছে, যা বাংলাদেশের অন্য কোথাও নেই।



জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী ওয়ারী, টিকাটুলী ও নারিন্দার ঠিক মাঝখানে দু'টি ভাগে বলধা গার্ডেন তৈরি করেছেন। বলধা গার্ডেনের এক পাশের নাম সাইকি এবং অপর পাশের নাম সিবিলা। বলধা গার্ডেনের সাইকি অংশটিতে সবার যাওয়ার অনুমতি নেই। এটা বন্ধ করে রাখা হয়। কারণ এমন কিছু দুর্লভ প্রজাতির গাছ রয়েছে যা মানুষের আনাগোণায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাইকিতে রয়েছে_ নীল, লাল ও সাদা শাপলাসহ রঙ্গিন পদ্মা, তলা জবা, অপরাজিতা, ক্যাকটাস, পামগাছ, জবা, প্রভৃতি। এখানে আরো রয়েছে_ 'সেপুগরি প্লান্ট' নামক শতবর্ষে একবার ফোটা ফুলের গাছ। সপ্তাহের প্রতিদিনই এটি সকাল ৮টা থেকে ১১টা এবং ২টা থেকে ৫টা খোলা থাকে।

বাহাদুর শাহ্ পার্ক

পুরানো ঢাকার সদরঘাটের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক বাহাদুর শাহ্ পার্ক। এর পশ্চিমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তর

পশ্চিমে জেলা আদালত অবস্থিত। পূর্বে এর নাম ছিল ভিক্টোরিয়া পার্ক।





১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবে শহীদ বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিপাহী যুদ্ধের ঐক্যের প্রতীক বাহাদুর শাহ্ জাফরের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় বাহাদুর শাহ্ পার্ক।



১৭ শতকে সম্রাট জাহাঙ্গীর ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপন করলে রাজধানী ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে বেশ কিছু কামান তৈরি করা হয়। এসব কামানের মধ্যে “কালে খাঁ জমজম” ও “বিবি মরিয়ম” বিশালত্বে, নির্মাণ শৈলীতে ও সৌন্দর্যে ভারতখ্যাত হয়ে ওঠে। “কালে খাঁ” বুড়িগঙ্গা নদীতে তলিয়ে গেলে বিবি মরিয়ম হয়ে ওঠে দর্শনীয় বস্তু। বিবি মরিয়মের দৈর্ঘ্য ১১ ফুট। মুখের ব্যাস ৬ ইঞ্চি। ঢাকার কামান তৈরীর কারিগর জনাধন কর্মকার অত্যন্ত শক্ত পেটানো লোহা দিয়ে কামানটি তৈরী করেন। সুবাদার মীর জুমলা ১৬৬১ সালে আসাম অভিযানের সময় ৬৭৫ টি কামান ব্যবহার করেন তার মধ্যে বিবি মরিয়ম ছিল সর্ববৃহৎ। যুদ্ধ বিজয়ের স্মারক হিসেবে তিনি বিবি মরিয়মকে বড় কাটরার দক্ষিণে সোয়ারীঘাটে স্থাপন করেন। তখন কামানটি মীর জুমলার কামান নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৪০ সালে তৎকালীন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ালটারস ঢাকার চকবাজারে এটিকে স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ১৯২৫ সালে বিবি মরিয়মকে সদরঘাটে স্থাপন করা হয়। গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিবি মরিয়মকে সদরঘাট থেকে এনে শহরের শোভাবর্ধনের জন্য ঢাকার কেন্দ্র স্থল গুলিস্থানে স্থাপন করা হয়। ১৯৮৩ সালে বিবি মরিয়ম কে গুলিস্থানের মোড় থেকে উঠিয়ে এনে ওসমানী উদ্যানের প্রধান ফটকের পেছনে স্থাপন করা হয়।



মিরপুরের চিরিয়া খানা আর এই বোটানিক্যাল গার্ডেন পাষাপাশি অবস্থিতো। বিশাল যায়গা নিয়ে অবস্থিত এই গার্ডেনে ৮২.৯ হেক্টর অংশে আছে শুধু গাছপালা। আরো আছে পুকুর খাল ও সরু রাস্তা। সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে একে একে দেখা পাওয়া যাবে গোলাপ বাগান, রাস্তার পাশে আকাশমনি, শাপলাপুকুর, বাঁশঝাড়, পান্নপুকুর, ইউক্যালিপটাসের বাগান, গ্রিনহাউজ, ক্যাকটাসঘর ও গোলাপ বাগান। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন খোলা থাকে।

রমনা পার্ক



শিশু পার্কের উল্টো পাশেই এই রমনা পার্ক অবস্থিত। এটি প্রতি দিন খোলা থাকে, কোনো প্রবেশ মূল্য নেই। এর ভিতরে আছে চমৎকার খাল, সরু পায়েচলার রাস্তা, অসংখ্য গাছ আর সবুজ ঘাসের লন। এর ভেতরে আছে চাইনিজ রেস্টুরাও।

ধানমন্ডি লেক

এই লেকটি সারা ধানমন্ডি এলাকা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে প্রায় ১০ কি.মি পর্যন্ত চরে গেছে। গড়পর্তা ৫০মিটার চওড়া এই লেকটির গভিরতা ৮ থেকে ৯ মিটার পর্যন্ত। এর বিভিন্ন অংশের উপরে রয়েছে সেতু পারাপারের জন্য, রয়েছে পথচারি বসে বিশ্রামের জন্য বসার ব্যবস্থাও। ৮নং সেতুর কাছে রয়েছে একটি ডিজি নামক ক্যাফে।

গুলশান লেক পার্ক

গুলশানের লেকের পার ছুরে এটি বিস্তৃত। মোটামুটি ২.৪১ হেক্টর যায়গা নিয়ে এর আধিপত্য।

ওয়াল্ডার ল্যান্ড

ঢাকাশহরের সম্ভ্রান্ত এলাকাতা গুলশানে এর অবস্থান অল্প একটু যায়গাতে বাচ্চাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে রাইড গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। এর প্রবেশ মূল্য ১০০টা মাত্র। চাইলে দেখে আসতে পারেন।

টগী ওয়ার্ল্ড

শহরের পাহাড়পথের অভিজাত বিপণি বসুন্ধরা সিটির লেভেল-৮এ টগী ওয়ার্ল্ড অবস্থিত। চীনের প্রাচীর, স্টাচু অফ লিবার্টি, তাজমহল, পিরামিড, আইফেল টাওয়ারের আদলে সাজানো হয়েছে এখানকার ১০টি রাইড।

শিশুপার্ক

রমনা পার্কের উল্টো পাশে এর অবস্থান। কম-বেশী ১৪টি রাইড এখানে রয়েছে বাচ্চাদের জন্য। এখানে বুধবার দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিনামূল্যে পথশিশুদের প্রবেশ করতে দেয়া হয়। রবিবারে শিশুপার্কটি বন্ধ থাকবেও সপ্তাহের বাকি দিনগুলি বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সকলের জন্য খোলা থাকে।

শ্যামলী শিশুমেল্লা

ছোটো এই শিশুপার্কটি শ্যামলী থেকে আগারগাঁওগামী রাস্তার মোরে অবস্থিত। এটি প্রতি দিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সকলের জন্য খোলা থাকে।

চিড়িয়াখানা

মিরপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের পামেই চিড়িয়াখানাটি অবস্থিত। বিশাল এই চিড়িয়া খানার বিস্তৃতি ৯৩ হেক্টর। বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর প্রাণী এখানে দেখতে মিলবে বিভিন্ন খাঁচায়। শীতকালে অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এটি খোলা থাকলেও, গ্রীষ্মকালে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত এটি খোলা থাকলে।

ঢাকা শহরের নবস্থাপত্য সমূহ

জাতীয় সংসদ ভবন

আমেরিকান স্থপতি লুইকান বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের নকশা করেন। তার নকশা অনুযায়ী ঢাকার শের-এ-বাংলা নগরে ২০৮ একর জমির উপর নির্মিত জাতীয় সংসদ ভবন এ উপমহাদেশের অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানের (বর্তমান পাকিস্তান) আইনসভার জন্য জাতীয় সংসদ ভবনের নির্মাণ শুরু হয় ১৯৬১ সালে।



১৯৮২ সালের ২৮শে জানুয়ারি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর একই বছরের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদের অষ্টম (এবং শেষ) অধিবেশনে প্রথম সংসদ ভবন ব্যবহৃত হয়।

ভাসানি নভোথিয়েটার



সংসদ ভবনের কাছাকাছি বিজয় সরণিতে এই আধুনিক তারামন্ডল বা নভথিয়েটারটি অবস্থিত। সরকারি ছুটির দিন ও বুধবার এটি বন্ধ থাকে। শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মোট চারটি সো এখানে দেখান হয়। আর অন্যান্য দিনগুলিতে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মোট তিনটি সো দেখান হয়। এক টিকেটে একই সাথে আপনি দুটি সো দেখতে পাবেন। প্রথম সোটি হবে মহাকাশ আর তারা দেব নিয়ে, আর দ্বিতীয় সোটি এক-এক সময় একেকটি দেখানো হয়।

ঢাকা শহরের পুরনো স্থাপত্য সমূহ

লালবাগ কেল্লাঃ



পাখির চোখে লালবাগ কেল্লা

মোগল আমলের স্থাপত্যকীর্তি লালবাগের কেল্লা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র মোহাম্মদ আজমের সময়ে নির্মিত এ কেল্লায় রয়েছে পরীবিবির সমাধি, দরবার গৃহ, হাম্মামখানা, মসজিদ, দুর্গ ইত্যাদি। বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে লালবাগ মহল্লায় এর অবস্থান।



লালবাগ কেল্লার একাংশ

সম্রাট আওরঙ্গজেব এর পুত্র আজম ১৬৭৮ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। নবাব শায়েস্তা খানের আমলে এর নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে।



পরিবিবির মাজার

শায়েস্তা খানের কন্যা পরী বিবির মৃত্যুর পর তিনি ১৬৮৪ সালে এর নির্মাণ বন্ধ করে দেন।



লালবাগ কেল্লা যাদুঘর।

কেল্লা এলাকাটিতে নিম্নের তিনটি ভবন রয়েছে -

কেন্দ্রস্থলের দরবার হল ও হাম্মাম খানা, যা এখন লালবাগ কেল্লা যাদুঘর।

পরিবিবির সমাধি

উত্তর পশ্চিমাংশের শাহী মসজিদ

এছাড়া দক্ষিণ-পূর্বাংশে সুদৃশ্য ফটক, এবং দক্ষিণ দেয়ালের ছাদের উপরে বাগান রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই কেল্লা এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

জিনজিরা প্রাসাদ

পুরান ঢাকার বড় কাটারার দক্ষিণ দিকে বুড়িগঙ্গা নদীর অপর তীরে জিনজিরা প্রাসাদ অবস্থিত। মুঘল সুবহাদার দ্বিতীয় ইব্রাহিম খান তাঁর প্রমোদ কেন্দ্র হিসেবে জিনজিরা প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা এর পতনের পর ঘসেটি বেগম, আমেনা বেগম, সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নেছা বেগম এবং তাঁর কন্যাকে জিনজিরা প্রাসাদে এনে বন্দী রাখা হয়। আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে শহর থেকে জিনজিরার মধ্যে চলাচলের জন্য একটি কাঠের পুল ছিল। প্রাসাদটির পূর্বাংশ তিনতলা সমান, মাঝ

বরাবর প্রকাণ্ড প্রাসাদ তোরণ। তোরণ প্রাসাদকে দুই ভাগ করে অপর প্রান্তে খোলা চত্বরে মিশেছে। প্রাসাদ তোরণের পূর্বাংশেই ছিল সুড়ঙ্গপথ।

আহসান মঞ্জিল



বুড়িগঙ্গা নদীর পাড় ঘেঁষে কুমারটুলি এলাকায় এই আহসান মঞ্জিলের অবস্থান। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শেখ ইনায়েত উল্লাহ আহসান মঞ্জিলের বর্তমান স্থানে রংমহল নামের একটি প্রমোদ ভবন নির্মাণ করেন। পরে বিভিন্ন হাতঘুরে তা নবাব আব্দুল গনির হাতে আসে। নবাব আব্দুল গনি ভবনটিকে পুনর্নির্মাণ করেন, ১৮৫৯ সালে নির্মাণকাজ শুরু হয়ে ১৮৭২ সালে শেষ হয়। নিজের ছেলে খাজা আহসান উল্লাহ-এর নামে “আহসান মঞ্জিল” নামটি তখনই রাখেন তিনি। পরে এ বাড়িতে নবাব আহসান উল্লাহ বাস করতেন।



মঞ্জিলটি দুটি অংশে বিভক্ত “রংমহল” এবং “অন্দরমহল”। প্রাসাদেটির উপরে অনেক সুদৃশ্য গম্বুজ রয়েছে। বর্তমানে এটি একটি জাদুঘর; প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থী এ জাদুঘর দেখতে এসে থাকেন। শনি থেকে বুধ, প্রতিদিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এবং শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সর্ব সাধারণের জন্য এটি খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনে আহসান মঞ্জিল বন্ধ থাকে।



১৯০৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল – জর্জ কার্জন এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। কার্জন হল নির্মিত হয়েছিল টাউন হল হিসেবে। নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করেন ভাওয়ালের রাজকুমার। বড়লাট বাহাদুরের আগমন উপলক্ষে ভাওয়ালের রাজকুমারগণ এ অঞ্চলে লর্ড কার্জন বাহাদুরের নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য ‘কার্জন হল’ নির্মাণের জন্য সেইসময় ১,৫০,০০০ টাকা দান করে ছিলেন।



কার্জন হল বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অণুষদের কিছু শ্রেণীকক্ষ ও পরীক্ষার হল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বড়কাটরা

চকবাজারের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার দিকে মুখ করে নির্মিত এই ইমারত। ১৬৪৪ সালে দেওয়ান আবুল কাশেম কাটরাটি শাহ সুজার বাসস্থান হিসেবে নির্মাণ করেন। তবে শাহ সুজা কখনোই এই কাটরাটিতে বাস করেন নাই। এটি মূলত মুসাফির, পঠিক ও আশ্রয়হীনদের সরাইখানা বা লঙ্গরখানা হিসেবে ব্যবহার হয়েছে।

বর্তমানে কাটরাটির একটি অংশ দখল করে রেখেছে একটি মাদ্রাসা আর অন্য আরেকটি অংশ দখল নিয়েছে বিভিন্ন স্তরের কিছু মানুষ।

ছোটকাটরাঃ

বড়কাটরা থেকে ১৮২.২৭মিটার পূবে এই ছোটকাটরার অবস্থান। ধারণা করা হয় ১৬৬২ অথবা ১৬৭১ সালে শায়েস্তা খাঁ এটি নির্মাণ করেন। বর্তমানে এটি সম্পূর্ণ বেদখল হয়ে গেছে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের হাতে।

নিমতলীর কুঠিবাড়ি

রাজধানী ঢাকার চানখাঁরপুল এলাকার পাশেই এই কুঠিবাড়ি অবস্থিত।

রোজ গার্ডেন

রোজ গার্ডেন আজও দাঁড়িয়ে আছে পুরনো ঢাকার গোপীবাগ এলাকায়। তৎকালীন নব্য জমিদার ঋষিকেশ দাস বিশ শতকের তৃতীয় দশকে (সম্ভবত ১৯৩০ সালে) গড়ে তোলেন এ গার্ডেন। বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর বাগান-বাড়ির আদলে নির্মিত হয়েছিল রোজ গার্ডেন। তৎকালীন উচ্চবিত্ত হিন্দু সমাজের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল বলধা জমিদারের বাড়ি। একদিন বিনা আমন্ত্রণে ঋষিকেশ গিয়েছিলেন বলধার এক জলসায়। কিন্তু ঋষিকেশ দাস সনাতনী ধর্মে নিম্নবর্ণ হওয়ায় তাকে সেখানে অপমানিত হতে হয়। তারপরই নির্মাণ করেন রোজ গার্ডেন।

রোজ গার্ডেনটি ছিল ২২ বিঘা জমির ওপর। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুর্লভ সব গোলাপ গাছে সুশোভিত করেছিলেন এ উদ্যানটি। বাগানের প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশ করতেই চোখে পরে একটি শান বাঁধানো পুকুর। গেট, পুকুর ও বাগানে ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলিতে নির্মিত অনেকগুলো ভাস্কর্য ছিল। বাগানের পুরো সীমানাজুড়ে ছিল আম গাছের সারি ও মাঝখানে অবস্থিত কারুকার্য মণ্ডিত দ্বি-তল এ ভবনটি।

রূপলাল হাউজ



রূপলাল হাউজ ঊনবিংশ শতকে নির্মিত একটি ভবন। এটি পুরানো ঢাকা এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর পারে ফরাসগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত। ভবনটি নির্মাণ করেন হিন্দু ব্যবসায়ী ভ্রাতৃদ্বয় রূপলাল দাস ও রঘুনাথ দাস। দ্বিতল এই ভবনের স্থাপত্য শৈলী অভিনব। ভবনটিতে ৫০টির অধিক কক্ষ রয়েছে, এবং কয়েকটি প্রশস্ত দরবার কক্ষ রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে রূপলাল হাউজ মসলা ও

সবজি ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যায়। তবে, বর্তমানে এটিকে অবৈধ দখলমুক্ত করে বাংলাদেশ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রাখা রয়েছে নামে মাত্র।

লালকুঠি



এটি নর্থব্রুক হল নামেও পরিচিত। বুড়িগঙ্গার পাড় ঘেঁষে ফরাশগঞ্জ মহল্লায় অবস্থিত। গোটা ইমারতটি লাল রঙে রঙিন বলে এর নাম হয়েছে লালকুঠি।



৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ১৬ অক্টোবর ঢাকার নতুন রাজস্ব ও ডাক অফিস খোলার জন্য ওই দিনেই ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খাজা মোহাম্মদ ইউসুফের উদ্যোগে নর্থব্রুক হলে একটি বড় সভা করা হয়। শহরের গণ্যমান্য মুসলমান ও ইউরোপিয়দের এতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সভায় ব্রিটিশ সরকারকে নতুন প্রদেশ গঠন ও ঢাকায় রাজধানী করার জন্য ধন্যবাদ ও সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের নানা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে এই নর্থ ব্রুক হলো।

ঢাকা শহরে ইসলামিক স্থাপত্য

বায়তুল মুককাররাম মসজিদ



বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ। স্থপতি টি. আব্দুল হুসেন খারিয়ানির নকশায় ও কাবা শরীফের আদলে এটি নির্মান করা হয়।

তারা মসজিদ



বিখ্যাত এই তারা মসজিদটি ঢাকার আর্মিনীটোলায় অবস্থিত। মসজিদের সারা গায়ে রয়েছে শত শত ছোট বড় তারার কারুকাজ। সাদা সিমেন্টের উপর চিনামাটির তারাকাকৃতি টুকরো বসিয়ে করা হয়েছে এই তারকাসজ্জা। আঠারশ শতকে ঢাকার জমিদার মির্জা গোলাম মসজিদটি নির্মাণ করেন।

হাজী খাজা শাহবাজ মসজিদ



১৬৭৯ সালে রমনা রেসকোর্সের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নির্মাণ করা হয়েছিল এই হাজী শাহবাজ মসজিদ। মাঝারি আকারের এই মসজিদটির তিন গম্বুজ রয়েছে। এখনো এটি টিপটপ অবস্থায় রয়েছে।

সাতগম্বুজ মসজিদ



মোহাম্মদপুর বাসস্টপের ১কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এই মসজিদটি অবস্থিত। এর তিনটি বড় গম্বুজ মূল সালাতকক্ষের উপর এবং বাকি ছোটো চারটি চার কোণে স্থাপিত। তাই অনেক আগে থেকেই এর নাম মানুষের মুখে মুখে সাতগম্বুজ মসজিদ হয়ে গেছে।

খান মোহাম্মদ মুধা মসজিদঃ



লালবাগ কেল্লা থেকে ৪০০ মিটার পশ্চিমে এই সুন্দর মসজিদের অবস্থান। এই তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির ভিত্তি প্রায় সতের ফুট উঁচু একটি প্ল্যাটফর্মের ওপর। প্ল্যাটফর্মের নীচে টানা করিডোর, পাশে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ, এখানে আলো ছায়ায় খেলা মনোমুগ্ধকর।



নিচের এই অংশটি ছিল আবাসিক মাদ্রাসা। এখন শুধু মসজিদটিই ব্যবহার করা হয়। ১৭০৬ সালে কাজী এবাদুল্লাহর নির্দেশে খান মুহাম্মদ মৃধা এটি নির্মাণ করেন। তার নামানুসারেই মসজিদটির নামকরণ হয় খান মুহাম্মদ মৃধা মসজিদ। এটি লালবাগের আতশ খানা রোডে অবস্থিত।

ধানমণ্ড শাহী ঈদগাহ



ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার সাত মসজিদ রোডে এটির অবস্থান। চারপাশে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই ঈদগাহ। দেওয়ান আবুল কাসিম ১৬৪০ সালে এটি নির্মাণ করেন।



ঢাকায় বেশকিছু দরগাহ বা মাজার রয়েছে তাদের মধ্যে মিরপুরের দরগাহ অন্যতম। যতদূর জানা যায় হযরত শাহ আলী হলেন সেই চল্লিশজন প্রচারকের একজন, যারা বাগদাদ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন ইসলাম প্রচারে। তিনি মিরপুরে আস্তানা গেড়েন আর এখানেই তাঁর মাজার শরীফ।

হোসেনী দালান



হযরত ইমাম হোসেন (রা:) -এর কারবালার শোকাবহ ঘটনার স্মরণে নির্মিত অপরূপ স্মৃতিসৌধ হোসেনী দালান। একজন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সৈয়দ মীর মুরাদ তৈরি করেছিলেন ঢাকার হোসেনী দালান। সৈয়দ মীর মুরাদ ছিলেন শাহ সুজার নৌবাহিনীর প্রধান। এই দালান নির্মাণের পেছনে একটি গল্প চালু রয়েছে। সেটি হচ্ছে_ এক রাতে স্বপ্নে সৈয়দ মীর মুরাদ দেখতে পেলেন হযরত ইমাম হোসেন (রা.) কারবালার যুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করছেন এবং তাকে অনুরূপ একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে বলেন। অতঃপর মীর মুরাদ ১০৫২ হিজরি মোতাবেক ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে এই ইমামবাড়া নির্মাণ করেন। এখানে রয়েছে হোসেনী দালান, ইমামবাড়া, পুকুর মাকবারা-এ নায়ের নাজিম স্থানে ৮ টি কবর, ইমাম হাসান (রা:) ও ইমাম হোসেন (রা:)-এর কবরের প্রতিকৃতি।

ঢাকা শহরের দুটি মন্দির ও গির্ঘা

ঢাকেশ্বরী মন্দির

লালবাগ কেপ্লা থেকে ৩০০ মিটার উত্তরপুবে এই সুন্দর মন্দিরের অবস্থান।



ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির ঢাকেশ্বরী। এর নির্মাণকাল ও নামকরণ নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট বিতর্ক। কিংবদন্তি অনুসারে একবার রাজা বিজয় সেনের রানি লাঙ্গলবন্দে স্নানে গিয়েছিলেন। স্নান শেষে ফেরার পথে তার একটি পুত্রসন্তান জন্মে ছিল, ইতিহাসে যিনি বঙ্গাল সেন নামে পরিচিত। বঙ্গাল সেন সিংহাসনে আরোহণের পর নিজের জন্মস্থানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নির্মাণ করেছিলেন এই মন্দির।



আরেকটি সূত্রে জানা যায়, বঙ্গাল সেন একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন এই জায়গায় জঙ্গলে ঢাকা অবস্থায় পড়ে আছে দেবী। বঙ্গাল সেন এই দেবীকে উদ্ধার করে সেখানে স্থাপন করে মন্দির, যা পরিচিত হয়ে ওঠে ঢাকেশ্বরী নামে।



ঢাকেশ্বরী মন্দিরকে নিয়ে আরেকটি কিংবদন্তি হচ্ছে, দক্ষ যজ্ঞের সতী নিকৃষ্ট পতির নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহ ত্যাগ করলে

শোকে মুহম্মান মহাদেব সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেন। এমন নৃত্যে সতীর অবমাননা হয় ভেবে বিষ্ণু তার চক্র দ্বারা সতীর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করেছিলেন। ফলে সতীর দেহ একান্নটি খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যে স্থানে পড়েছিল সে স্থানগুলো এক একটি পীঠস্থানে পরিণত হয়। সতীদেহের উজ্জ্বল কিরীটের ডাক তথা উজ্জ্বল গহনার অংশবিশেষ এ স্থানে পতিত হলে ওই স্থানের নাম হয় ঢাকা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঢাকেশ্বরী নামে পরিচিতি পায়।

আর্মেনীয় গির্জা



পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় একসময় বিপুলসংখ্যক আর্মেনীয়ের বসবাস ছিল। আর্মেনীয়দের বসবাসের কারণেই ওই এলাকার নামকরণ হয় আরমানিটোলা বা আর্মেনিয়ান স্ট্রিট। মূলত সম্রাট আকবরের অনুমতি সাপেক্ষে আর্মেনীয়রা ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, বসতি স্থাপন ও গির্জা নির্মাণ করে। ব্যবসার কারণে একসময় ঢাকায় আর্মেনীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তারা আরমানিটোলায় বসতি স্থাপন ও একটি ক্ষুদ্র গির্জা স্থাপন করে প্রার্থনা করত এবং তাদের কারও মৃত্যু হলে তেজগাঁও রোমান

ক্যাথলিক গির্জার পাশে মরদেহ সমাহিত করত। ১৭৮১ সালে একজন বিত্তবান আর্মেনীয় নিকোলাস পোগজ বেশ কয়েক বিঘা জমিতে ওই ক্ষুদ্র গির্জার স্থলে একটি বিশাল গির্জা নির্মাণ করেন। তিনি গির্জাটির নামকরণ করেন চার্চ অব দ্য রিজারেকশন।



ঢাকা শহরের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপত্য

শহীদ মিনার



ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে ২১ ও ২২ তারিখে ভাষার দাবীতে শহীদদের স্মরণে একটি শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু করে। মিনারটি তৈরি হয় মেডিকেলের ছাত্র হোস্টেলের (ব্যারাক) বার নম্বর শেডের পূর্ব প্রান্তে। কাজ শেষ হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোরে।

মিনার তৈরির তদারকিতে ছিলেন জিএস শরফুদ্দিন (ইঞ্জিনিয়ার শরফুদ্দিন নামে পরিচিত), ডিজাইন করেছিলেন বদরুল আলম। সাথে ছিলেন সাঈদ হায়দার। তাদের সহযোগিতা করেন দুইজন রাজমন্ত্রী। মেডিকেল কলেজের সম্প্রসারণের জন্য জমিয়ে রাখা ইঁট বালি এবং পুরান ঢাকার পিয়ারু সর্দারের গুদাম থেকে সিমেন্ট আনা হয়। ভোর হবার পর একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় মিনারটি। ঐ দিনই অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে, ২২ ফেব্রুয়ারির শহীদ শফিউরের পিতা অনানুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে দশটার দিকে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। এই দিন পুলিশ ও সেনাবাহিনী মেডিকেলের ছাত্র হোস্টেল ঘিরে ফেলে এবং প্রথম শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলে। এরপর ঢাকা কলেজেও একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হয়, এটিও একসময় সরকারের নির্দেশে ভেঙ্গে ফেলা হয়।



অবশেষে, বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেবার পরে ১৯৫৭ সালের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাজ শুরু হয়। এর নির্মান কাজ শেষ হয় ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে।

১৯৫৬ সালে আবু হোসেন সরকারের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বর্তমান স্থান নির্বাচন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে জনৈক মন্ত্রির হাতে ‘শহীদ মিনারের’ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা থাকলেও তাতে উপস্থিত জনতা প্রবল আপত্তি জানায় এবং ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ রিক্সাচালক আওয়ালের ৬ বছরের মেয়ে বসিরণকে দিয়ে এ স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। সংগ্রামের প্রতীক এ শহীদ মিনার প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারী ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় আজও।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাছেই পূর্ব পাশে রয়েছে দোয়েল। আর দোয়েল চত্বরের একটু পশ্চিমে আমাদের জাতীয় তিন নেতার সমাধি। এই তিন নেতা হলেন শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং খাজা নাজিমউদ্দিন।



১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সহযোগীদের সহায়তায় দেশের যে সকল শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্যদের হত্যা করেছিল তাঁদের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ঢাকার রায়ের বাজার ইউথোলায় এ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়।



১ নং মিরপুর এলাকায় গাবতলী মাজার সড়কের পশ্চিমে এর অবস্থান। শহীদদের স্মরণে লাল রং করা তিনটি থামের সমন্বয়ে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। এর চারদিকে রয়েছে পরিখা ও বাগান। বাগানের ভিতরে পায়ে চলা পথ ও বসার ব্যবস্থা রয়েছে।

ঢাকা শহরের যাদুঘর সমূহ

কম বেশি ৪০টির মত যাদুঘর রয়েছে ঢাকা শহর জুড়ে। সবগুলিকে এখানে দেখাতে পারছি না। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু তুলে ধরছি শুধু। আহসান মঞ্জিল আর লালবাগ কেল্লায় একটি করে দুটি যাদুঘরের কথা আগেই বলেছি। আরো যেগুলি উল্লেখ করতে চাই তা হচ্ছে-

শাহবাগে অবস্থিত “বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর”।

ঢাকার জিরোপয়েন্টের পাশে জিপিও ভবনে রয়েছে “পোস্টাল জাদুঘর”।

“জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর” টি দেখতে পাবেন আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকাতো।

৫নং সেগুন বাগিচায় রয়েছে “মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর”।

ধানমন্ডি আবাসিকের ১০নং সড়কের ৩২ নং বাড়িতে রয়েছে “বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর”।

রাজার বাগের পুলিশ লাইনে আছে “পুলিশ জাদুঘর”।

মিরপুর চিড়িয়া খানায় রয়েছে “প্রাণী জাদুঘর”।

তাছাড়া আরো আছে- “সেনানিবাস জাদুঘর”, “ঢাকা নগর জাদুঘর”, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে রয়েছে বিভাগীয় জাদুঘর, “নজরুল জাদুঘর”, “এ্যানাটমি জাদুঘর”, “বিমান বাহিনী জাদুঘর”, “শিশু জাদুঘর” “সামরিক জাদুঘর” ইত্যাদি।

গ্রন্থ তালিকা

১। বেড়াই বাংলাদেশ : মোঃ মোশারফ হোসেন।

২। বাংলাদেশ-ভারত ভ্রমণ : টি.এম. জালাল উদ্দিন।

৩। বাংলাদেশে পর্যটন আকর্ষণ : দেবাশিষ দাশ।

ইত্যাদি

ম্যাগাজিন তালিকা

১। ভ্রমণ বিচিত্রার বিভিন্ন ইস্যু।

২। ভ্রমণ বার্তা ঈদ সংখ্যা ২০০৭।

৩। ওয়ার্ল্ড ভিউ এর কিছু ইস্যু।

তাছাড়া নিজস্ব ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকে কিছু যুক্ত হয়েছে। অনেক তথ্য ও সকল ছবিই পেয়েছি [google](https://www.google.com) ব্যবহার করে। বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে আগে থেকে টুকে রাখা তথ্য এখানে ব্যবহার করেছি।

ইচ্ছে থাকার পরেও অনেক ছবি ও বর্ণনা বাদ দিতে হয়েছে টপিকের কলেবরের কথা চিন্তা করে। তারপরেও এর আকার যা হয়েছে তাতে আমি খুব ভালই বুঝতে পারছি আনেকেই পুরটুকু পড়বেন না।

সব শেষে সমস্ত প্রকারের ভুল ও স্বল্পজ্ঞানহেতু তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।